তুলি-কলম

১২৫ বর্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ : ফিরে দেখা

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

আত্ম-আবিষ্কারের আকুতি প্রায় সব জাতির রেনেসাঁসের এক বিশিষ্ট চরিত্রলক্ষণ। বাংলার নবজাগরণও তার ব্যতিক্রম নয়। আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা ও মননে দীক্ষিত হয়ে বাঙালি চাইছিল তার ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার। আর স্বাভাবিকভাবেই বিদেশি শাসকশ্রেণি এই বিষয়ে শুধু যে উদাসীন ছিল তা-ই নয়, ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিবন্ধকতারও কারণ হত।

মেকলে তাঁর শিক্ষাবিষয়ক বহু-আলোচিত Minute-এ ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ব্রিটিশ-সরকারি উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে উল্লেখ করে গেছেন : ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ফলে এমন এক মোহগ্রস্ত শিক্ষিত শ্রেণির সৃষ্টি হবে যারা, "Indian in blood and colour but English in tastes, in opinions and in words, and in intellect"। সুখের কথা, এই পরিকল্পনা আমাদের নতুন যুগের পথপ্রদর্শক চরিত্রদের ক্ষেত্রে একেবারেই ফলপ্রসূ হল না। যেমন—রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ। তাঁদের নিজস্ব মত ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যতই তফাত থাক, একটি বিষয়ে তাঁদের অবস্থান অভিন্ন : তাঁরা সচেতনভাবে মেকলের সেই স্বপ্নভূমির বিপ্রতীপে। দেশে নবাগত পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প তাঁরা যথেষ্ট অভিনিবেশ সহকারে আয়ত্ত করেছেন। সেইসঙ্গে মুক্তচিত্তে ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধিতে নিজস্ব ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন এবং পূজনে আগ্রহী হয়েছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ২৩ জুলাই ১৮৯৩ (৮ শ্রাবণ ১৩০০ বঙ্গাব্দ) 'বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচার' প্রতিষ্ঠিত। শুরুর ছয় মাসের মাথায় উমেশচন্দ্র বটব্যাল অসন্তোষ প্রকাশ করলেন, ''অপর ভাষায় দেশের লোকের কাছে আত্মপরিচয় দিয়া বেড়াইতে লজ্জাবোধ হয়।" অনেকেই তাঁকে সমর্থন জানালেন। বছর ঘোরার আগেই ১৭ বৈশাখ ১৩০১ নাম বদল করে দেশীয় নাম রাখা হল 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ'। রাজনারায়ণ বসু দাবি জানালেন, পরিষদের সব আলোচনা হবে বাংলা ভাষায়, প্রতিবেদন লেখাও হবে বাংলায়। এমনকী বাংলায় আলোচনা চলাকালীন কেউ ইংরেজি ব্যবহার করলে তাঁকে শব্দ পিছু এক পয়সা করে জরিমানা দিতে হবে। জরিমানা সংগ্রহের বিষয়টি

বাদ দিয়ে প্রস্তাবের বাকি পুরোটিই গৃহীত হল।

পরিষদের আদর্শ হিসেবে উচ্চাকাঙ্ক্ষীরা সামনে রেখেছিলেন ফ্রেঞ্চ একাডেমি অফ লিটারেচারকে। 'সাহিত্য পরিষদের সারথি' রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তা নিয়ে পরবর্তী কালে কিছু রসিকতাও করেন : ''প্রথমে যখন সাহিত্য পরিষদের সৃষ্টি হয়, তখন সুবিখ্যাত ফরাসি একাডেমির আদর্শ অনেকের মনে ছিল। এমনকী সাহিত্য পরিষদের ইংরেজি (পূর্ব) নাম—Bengal Academy of Literature সেই আদর্শেই প্রস্তুত হইয়াছিল।... হইয়া থাকিলেও হাতির অনুকরণ মূষিকের পক্ষে বিজ্ঞানুমোদিত নহে।'' এরপর তিনিই বাস্তব কথাটি বলেছেন, ''সাহিত্য পরিষদের আদর্শ অনেকটা বাঙ্গালার এশিয়াটিক সোসাইটির মতো।... এশিয়াটিক সোসাইটি মুখ্যতঃ ভারতবর্ষের জন্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মুখ্যতঃ বাঙ্গালার জন্য আপনার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন।''

তাহলে এই প্রতিষ্ঠান তৈরির উদ্দেশ্য আমরা কী বুঝব? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এক সরল উত্তর দিয়েছিলেন, ''বুঝিব এই যে বাংলাদেশবাসী দশজন লোক একত্র হইয়া, বাংলা সাহিত্যের আলোচনা যেখানে করে, তাহার নাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। এখানে একটা কথা নূতন আছে, বাংলাদেশবাসী। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, এই তিনটি শব্দের মধ্যে বাংলাদেশবাসী বুঝায় এমন কোনও শব্দ নাই। কিন্তু ওইটি উহ্য না করিলে মানেই হয় না।''

এই যে বিশিষ্ট দুই মানুষের কথা পরপর উদ্ধৃত করলাম, এই দুজনেই পরিষদের প্রথম দিকের প্রধান প্রতিপালক। বস্তুত বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক সাহিত্য পরিষদের ইতিহাসে 'রামেন্দ্রসুন্দরের যুগ' হিসেবে চিহ্নিত। আর, তৃতীয় দশকের প্রধান কর্মকর্তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পরিষদের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে অভ্র ঘোষ জানিয়েছেন, ''কেবল তাহলে সারস্বত সাধনার দিক থেকেই নয়, পরিষদের গঠনতন্ত্র ও দৈনন্দিন আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার বিষয়েও এই মমত্বময় কাণ্ডজ্ঞান রামেন্দ্রসুন্দরের পর হরপ্রসাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। সন্দেহ নেই যে এসব কথা তিনি একা ভাবেননি, পরিষৎ-সম্পাদক খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, যতীন্দ্রনাথ বসু এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাজশেখর বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো আরও বহু বরেণ্য মানুষ ছিলেন পরিষদে তাঁর একান্ত সহযোগী।'' এই তালিকায় অবশ্যই যোগ করতে হবে জগদীশচন্দ্র বসু, যদুনাথ সরকার, সজনীকান্ত দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখের নাম। আর পরিষৎ তার জন্মকাল থেকে অভিভাবক হিসেবে পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

সাধারণ মানুষের কাছে সাহিত্য পরিষদের মূল পরিচয়, সেটি একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার। যদুনাথ সরকার ঋণস্বীকারের ভঙ্গিতে তাঁর শিষ্য-সহকর্মী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, ''আজ যে পরিষদের পুস্তকাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির পরই সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা-সহায়ক কেন্দ্র হইয়াছে—শুধু বাঙ্গলা গ্রন্থ নহে, ইংরেজী ও অন্য কোনও কোনও ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থে—তাহা ব্রজেন্দ্রনাথের গৃহিণীপনার ফল।'' শুধু বই সংগ্রহ নয়, গ্রন্থালয়ের বইয়ের আধুনিক ক্যাটালগ তৈরিতেও তিনি নিষ্ঠাবান।

কিন্তু শুধু তো গ্রন্থাগার নয়, বাঙালির সারস্বত গবেষণা এবং জ্ঞানচর্চার বিবিধ বৃত্তে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছে। পরিষদের স্বর্ণসময়ের সেইসব কৃতিত্বের স্মৃতিচারণ করতে আমরা তিনটি ধারায় আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাব :

১) বাংলা ভাষার অভিভাবকত্ব
২) ইতিহাসচেতনার বিস্তার
৩) শিকড় সন্ধান।

বাংলা ভাষার অভিভাবকত্ব

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠার কালে বাংলা কাব্য প্রায় সহস্রবর্ষ অতিক্রান্ত, বাংলা গদ্যের বয়সও একশো বছর পেরিয়ে গেছে। তরুণ রবীন্দ্রপ্রতিভার কিরণচ্ছটায় ঐতিহ্যশালী বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণ তখন উদ্ভাসিত। এই সময়েই পরিষদের প্রাজ্ঞজনেরা মনে করলেন, বাংলা ভাষা প্রণালীবদ্ধ করা আবশ্যক—তার একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ এবং প্রামাণিক অভিধান তৈরি করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ সহ সেই সময়ের অনেক অগ্রণী লেখক-সাহিত্যিকও এই বিষয়ে সহমত হলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

প্রাথমিকভাবে মনে করা হল, অভিধানটিতে বিশেষজ্ঞরা ''যে শব্দ নিয়মসঙ্গত ও উত্তম জ্ঞান করিতেন, তাহা গ্রাহ্য এবং যাহা অশুদ্ধ ও অসামাজিক বিবেচনা করিতেন তাহা অগ্রাহ্য'' হবে। এর ফলে ''সভা [পরিষৎ] দ্বারা অভিধান প্রকাশিত হইলে তাহাতে যে যে শব্দের স্থান নাই, কোনও লেখক তাহা ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবেন না, এবং ইহাতেই ভাষা প্রণালীবদ্ধ হইবেক।'' এই নিগড় অবশ্যই বাস্তবোচিত নয়, কিন্তু ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার আকুতিটিকে চিনে নিতে ভুল হয় না।

ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি সেই আমলেই যে দো-আঁশলা বাংলা ব্যবহার করতেন সে-সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : ''একদল আছেন, তাঁহারা পড়েন ইংরাজি, ভাবেন ইংরাজিতে, লিখিতে চান বাংলায়—যে একরকম সাহেবি বাংলা হইয়া পড়ে।'' শাস্ত্রীমশাই রসিকতা করে যেমন বাংলার নমুনা পেশ করেছেন : ''আমি ল্যান্ডো গাড়িতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া স্টেশনে পঁহুছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম। ফার্স্টক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকান্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড্ করিয়া একটু শর্ট ন্যাপ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় হুইসিল দিয়া ট্রেন স্টার্ট করিল।''

অনুরূপ সমস্যা সৃষ্টি করছিলেন সংস্কৃতপন্থী বিশুদ্ধ-বাদীরা। প্রায় ৭০০ বছরের মুসলমান শাসনকালে বাংলা ভাষা ও তার শব্দভাণ্ডারে যে-বিদেশি প্রভাব পড়েছে তাকে তাঁরা শুচিবায়ু-গ্রস্ততায় অস্বীকার করতে চাইছিলেন। ১৩২১-এর অষ্টম সাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্য শাখার সভাপতির ভাষণে শাস্ত্রীমশাই এই মতবাদকে অস্বীকার করতে চাইলেন : ''অনেকের সংস্কার, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের কন্যা। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সংস্কৃতকে বাঙ্গালা ভাষার ঠানদিদি বলিয়াছেন। আমি কিন্তু সংস্কৃতকে বাঙ্গালার অতি-অতি-অতি-অতি-অতি-অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহী বলি।'' তিনি তাঁর উদার মতের কথা জানালেন, ''আমি বলি, যাহা চল্‌তি, যাকে সকলে বুঝে—তাহাই চালাও; যাহা চল্‌তি নয়, তাহাকে আনিও না। যাহা চল্‌তি, তাহা ইংরাজিই হউক, পারসিই হউক, সংস্কৃতই হউক—চলুক। তাহাকে

বদলাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই। 'রেলওয়েকে' 'লৌহবর্ত্ম' করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই।" রবীন্দ্রনাথ সহ অধিকাংশ বিশিষ্ট বাঙালি লেখকও এই বিষয়ে সহমত। ব্যাকরণ প্রসঙ্গেও তাঁদের ভাবধারা এইরকমই উদার। তাঁরা বিশ্বাস করেন, বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি, বাক্যগঠন ও শব্দপ্রয়োগ রীতি, বানান, উপভাষা-অপভাষার শব্দগঠন ও ব্যবহারবিধি সবকিছু বিবেচনা করে তার ব্যাকরণ তৈরি করতে হবে; সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রেক্ষাপট এক্ষেত্রে অবশ্য বিচার্য ঠিকই, কিন্তু তার সূত্রাবলি সর্বত্র অবশ্যগ্রাহ্য হবে না।

কিন্তু সংস্কৃতপন্থীরা অনড় থাকলেন—বাংলা ভাষায় স্বীকৃত শব্দভাণ্ডার এবং ব্যাকরণ হবে সম্পূর্ণত সংস্কৃত অনুযায়ী। পরিষদের এই প্রায়-জন্মকালে দানা-বাঁধা তাত্ত্বিক বিতর্কের সমাধান হল না শতাধিক বছরেও। এই দীর্ঘ সময়কালে পরিষদের বিভিন্ন মাসিক অধিবেশন ও বিশেষ আলোচনাসভায় প্রচুর আলোচনা-বিতর্ক হয়েছে—তা সময়বিশেষে এমনকী বিতণ্ডায় পর্যবসিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে দায়িত্ব বণ্টন করে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে 'শব্দ সমিতি', 'ভাষাবিজ্ঞান সমিতি', 'পরিভাষা সমিতি' ইত্যাদি তৈরি হয়েছে।

দুই পক্ষেরই বহু মূল্যবান প্রবন্ধ পরিষদের মুখপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই কয়েক প্রজন্মব্যাপী বিতর্ক শেষ পর্যন্ত নিষ্ফলাই থেকে গেছে—কোনও প্রামাণিক ব্যাকরণগ্রন্থের রূপ পায়নি। অভিধানও পরিষদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে একটিই—প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি রচিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'। সেটিরও প্রথম মুদ্রণের পর যুগোপযোগী কোনও সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ পরিষৎ কর্তৃপক্ষ নেননি।

কিছু দশক আগে প্রামাণ্য ব্যাকরণ বই প্রকাশের শেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ভাষাচার্য সুকুমার সেনের নেতৃত্বে। কিন্তু সেটিও শেষ পর্যন্ত তীব্র মতবিরোধের কারণে পরিত্যক্ত হয়। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, শিক্ষিত বাঙালিমানসে বাংলা ভাষা প্রণালীবদ্ধ করার চেতনা প্রথম সঞ্চার করেন সাহিত্য পরিষদের কর্তাব্যক্তিরাই।

ইতিহাসচেতনার বিস্তার

অবশ্যই এই ইতিহাস রাজা-রাজড়ার ইতিহাস নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস এবং এই ইতিহাসচর্চার প্রথম সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করার কৃতিত্ব সাহিত্য পরিষদের। এক রূপরেখা অনুসারে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন কর্তাব্যক্তিরা : প্রাচীন কাব্যাদি মূল রূপে আস্বাদ, প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রম ও নবীন সাহিত্যে তার প্রভাব, এবং অতীত জাতীয় জীবনের ইতিহাস অন্বেষণ।

এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সক্রিয়তা দেখা গেল প্রাচীন বাংলা পুঁথি সংগ্রহ ও তার প্রকাশে। বিদেশি প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা পুঁথি সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র তখন ছিল এশিয়াটিক সোসাইটি। তাঁরা প্রাচীন ভারতবর্ষ সহ এশীয় নানা দেশের পুঁথি সংগ্রহ করতেন। বাংলা পুঁথি অন্বেষণে আলাদা গুরুত্ব দেওয়ার কোনও সুযোগ সেখানে ছিল না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সেই কাজটিই নিরন্তর, নিষ্ঠাভরে করে গিয়েছে সাহিত্য পরিষৎ। আদর্শ হিসেবে সামনে ছিল এশিয়াটিক সোসাইটির বিবলিওথিকা ইন্ডিকা।

উল্লেখযোগ্য যেসব পুঁথি আবিষ্কৃত হয় তার মধ্যে রয়েছে পরাগলী মহাভারত (কবীন্দ্র পরমেশ্বর), গোবিন্দবিজয় (গুণরাজ খান), পদ্মপুরাণ (নারায়ণ দেব), কৃষ্ণমঙ্গল (দ্বিজ মাধব), শ্রীকৃষ্ণবিজয় (মালাধর বসু), মহাভারত (কবীন্দ্র সঞ্জয়), কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী (রঘুনাথ ভাগবতাচার্য) ইত্যাদি। তবে প্রাচীনতা ও গুরুত্বের বিচারে উদ্ধার হওয়া প্রাচীন বাংলা পুঁথিগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন বড়ু

চণ্ডীদাস রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

এই পুঁথি উদ্ধার এবং চর্চার ঐতিহাসিক গুরুত্বটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩২১ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত পরিষদের সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির ভাষণে : ''বাঙ্গালা পুঁথি খোঁজা হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই কয়টি উপকার হইয়াছে, —(১) বাঙ্গালা দেশে আজিও যে বৌদ্ধধর্ম্ম জীয়ন্ত আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। (২) মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রকাণ্ড সাহিত্য ছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। (৩) সে সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু, দুই ধর্ম্মেরই উন্নতি হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। (৪) অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙ্গালা ইতিহাসের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলো প্রবেশ করিয়াছে।''

পুঁথির পাশাপাশি প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত গ্রন্থগুলি 'বিশুদ্ধরূপে', অর্থাৎ মূল রূপটিকে খুঁজে প্রকাশ করার কাজেও হাত দেওয়া হয়। কাশীদাসী মহাভারত, কবিকঙ্কন চণ্ডী, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ইত্যাদির মূল পাঠ খোঁজার চেষ্টা চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বিদ্যাপতির পদাবলী সংকলন বার করার। কিন্তু এই উদ্যোগগুলির প্রায় কোনওটিই পুরোপুরি সফল হয়নি। অর্থাৎ উল্লেখযোগ্য প্রাচীন গ্রন্থগুলির সামগ্রিক পাঠ নিরূপণে সচেতন উদ্যোগ নিলেও পরিষৎ তাতে সফল হতে পারেনি। সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত কাশীরাম দাসের 'মহাভারত, আদি পর্ব'-এর ভূমিকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্বীকার করে নিয়েছেন যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য 'জড়াপট্টি'—লিখেছেন একজন, আখ্যান জোগান দিয়েছেন একজন, নকল করেছেন আর-একজন।

কিন্তু কোনও জাতির ইতিহাস অনুধাবনের জন্য তার 'আদিরূপ উদ্ধার' অবশ্যই প্রয়োজনীয়, নাহলে জাতীয় চরিত্রের উৎসটি হারিয়ে যায়। সেই শিকড় সন্ধানের আকুতিতে পরিষদ তার কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত করার তাগিদ বোধ করল। মূল প্রেরণা এল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। পরিষদের একাদশ সাংবাৎসরিক কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হল, ''এই বৎসর পরিষদের জীবনে নতুন পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে পরিষৎ বিস্তৃততর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।...

''...রবীন্দ্রবাবুর অভিপ্রায় যে, অতঃপর বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে তাহাই পরিষদের আলোচ্য হউক; যেন পরিষদের কার্যালয়ে আসিলে বাংলাদেশের সম্বন্ধে যেকোনো জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।''

কাজের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করতে গেলে পরিষদের নাম-নির্দিষ্ট চৌহদ্দি নিয়ে যাতে প্রশ্ন না ওঠে তাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'সাহিত্য' শব্দটির অর্থ করতে চাইলেন 'বাঙ্ময়' : ''মানুষের মুখ হইতেই হোক আর কলমের মুখ হইতেই হোক, বার হইলেই বাঙ্ময়ের অধিকার আসিয়া যাইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মধ্যে যে সাহিত্য শব্দ আছে তার অর্থ কোনোরূপ সংকোচ না করিয়া বাঙ্ময় অর্থেই লইতে হইবে, নাহলে পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের আলেখ্য ছড়াগুলি, মাঝিদের সারিগান এবং অনেক ধর্মের ছড়া ইত্যাদি জিনিসগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিকারের মধ্যে আসিতে পারে না।''

ধীরে ধীরে এই 'অধিকারের' সীমা যুক্তিযুক্তভাবেই অনেক বিস্তৃত হয়েছে।

শিকড়ের সন্ধান

বাঙালির জাতীয় জীবনে সে এক সন্ধিক্ষণ—লর্ড কার্জন পরিকল্পিত বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদী বাংলার স্বাদেশিকতা ও স্বদেশপ্রেম তখন তুঙ্গে। এই পরিবেশে ১৯০৬ সালে কলকাতায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন বসে। এর শিল্প ও

কৃষি প্রদর্শনীতে সাহিত্য পরিষৎ তার কিছু নির্বাচিত সংগ্রহ নিয়ে যোগদান করে। যেমন তাম্র ও প্রস্তরলিপির ছাপ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থাপত্যের আলোকচিত্র, পুরনো আমলের কিছু চিত্রকলা, স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত দ্রব্য ও পাণ্ডুলিপি। দর্শকদের ইতিবাচক সাড়া পেয়ে পরিষৎ কর্তৃপক্ষ মনে করেন তাঁদের ভবনে একটি স্থায়ী মিউজিয়াম স্থাপন করা প্রয়োজন। তাতে জাতীয়তাবোধের জাগরণ তথা লোকশিক্ষা হবে, এবং সেইসঙ্গে পরিষদের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণের পরিকল্পনাটিও একটি সুষ্ঠু রূপ পাবে। প্রাথমিকভাবে এই মিউজিয়ামকে 'চিত্রশালা' হিসেবে অভিহিত করা হলেও, তার সংগ্রহের সম্ভাব্য-ব্যাপকতার কথা ভেবে নাম দেওয়া হয় 'সারস্বত-ভবন'। ফেব্রুয়ারি ১৯১০ ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে পরিষদের কার্যনির্বাহী সমিতির প্রতিনিধি হিসেবে পরিষৎ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর প্রস্তাব রাখেন, ''বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে যে 'সারস্বত-ভবন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছিল, এই অধিবেশনও সেই প্রস্তাব পুনঃ সমর্থন করিতেছেন এবং এই সম্মিলনে ইচ্ছা করেন যে, ওই 'সারস্বত-ভবন' [সম্প্রতি প্রয়াত] স্বর্গীয় রমেশচন্দ্রের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপে 'রমেশচন্দ্র সারস্বত-ভবন' নামে প্রতিস্থাপিত করিবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হইবে...।''

ওই ১৯১০ সালেই, পরিষৎ প্রতিষ্ঠার ষোলো বছরে সংগ্রহশালাটি বাস্তব রূপ পায়। এর প্রাণপুরুষ ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। কিন্তু যাঁর উদ্যম ও কর্মতৎপরতায় এই ভবনের প্রাথমিক সমৃদ্ধি, তিনি মহেঞ্জোদড়ো-আবিষ্কারক ঐতিহাসিক তথা পুরাবিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে পুরাবস্তু সংগ্রহ করে আনতে থাকেন। তাছাড়া পরিষদের এই শিকড়-সন্ধানী উদ্যোগে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার বিভিন্ন জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেদের অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রাচীন মূর্তি, মৃৎফলক, মুদ্রা ইত্যাদি পাঠিয়ে সারস্বত-ভবনের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করতে থাকেন।

সংগ্রহশালায় সংগৃহীত পুরাবস্তুগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য নিদর্শনগুলি। উত্তর-পশ্চিম ভারতের গান্ধার থেকে পূর্ববঙ্গ সহ বিস্তৃত জায়গা জুড়ে ভাস্কর্যগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে সংখ্যা ও গুণ উভয় বিচারেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাংলার প্রাচীন ও প্রাক্-মধ্যযুগের ভাস্কর্যগুলি। এগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি থেকে সংগৃহীত, কান্দির কিশোরীমোহন সিংহ প্রদত্ত তিনটি ব্রোঞ্জ-নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি পৃথক উল্লেখের দাবি রাখে। একাদশ শতাব্দীর এই তিনটি মূর্তির নান্দনিক উৎকর্ষ বহুজনবন্দিত। উইলিয়ম রোটেনস্টাইন ১৯১১ সালে সারস্বত-ভবন পরিদর্শন করে এই মূর্তি তিনটি সম্পর্কে মন্তব্যে লিখেছিলেন, ''I have just seen 3 bronzes in this small museum which it would be impossible to match, I think, anywhere in the world. এই তিন মূর্তির চেয়ে পবিত্রতর আর সুন্দরতর কিছু আমি কল্পনাও করতে পারছি না। আমি মনে করি, এমন দিন নিশ্চয় আসবে যখন full justice will be done to the genius of the people which has produced them and so many other admirable things.''

মৃৎশিল্পের পরেই সারস্বত-ভবনের অপর উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ তার মৃৎশিল্প। এগুলির অধিকাংশই খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দীর কাজ, পূর্ব ভারত থেকে সংগৃহীত। চন্দ্রকেতুগড়ের মৃৎফলকে যক্ষ-যক্ষিণী ও অদ্ভুতদর্শন পশুপাখির ছবি। রাজগৃহ ও বুদ্ধগয়া থেকে আহৃত মৃৎফলক-গুলি বৌদ্ধধর্মাশ্রিত, অধিকাংশেই বুদ্ধমূর্তি উপস্থিত।

আবার গৌড়-পান্ডুয়া থেকে পাওয়া ফলকে সুলতানি আমলের অলংকরণ, মানুষ বা পশুপাখির পরিবর্তে লতা-পাতা-ফুল বা জ্যামিতিক নকশার সূক্ষ্ম কাজ। তাছাড়া অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর মন্দির অলংকরণের কিছু নিদর্শনও এখানে আছে।

এই সবগুলিই দেশীয় শিল্পের শিকড়কে চিনিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য মনে পড়ে : ''আর্ট স্কুলে ভর্তি হইয়াছি কিন্তু আমাদের দেশে শিল্পকলার আদর্শ দেশের মধ্যেই আছে—একবার যদি আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায় তবে ইহাকে আমাদের সমস্ত দেশের মধ্যে, থালায়, ঘটিতে, বাটিতে, ঝুড়িতে, চুপড়িতে, মন্দিরে, মঠে, বসনে ভূষণে, পটে, গৃহভিত্তিতে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ একটি সমগ্র মূর্তিরূপে দেখিতে পাইতাম।''

এমন বহুবিচিত্র পুরাবস্তু সম্ভারের পাশাপাশি অন্য ধরনের আর এক সংগ্রহ সারস্বত ভবনকে বিশিষ্টতা দিয়েছে : ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ প্রমুখের ব্যবহৃত পোশাক, আসবাবপত্র, দোয়াত-কলম, চশমা, ঘড়ি, লাঠি ইত্যাদি। এইসব মানুষদের মধ্যে আছেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু মিত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। রয়েছে অনেকের লেখা চিঠি ও পাণ্ডুলিপি। রয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর কিছু দানপত্র—যেমন, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, ন্যায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও রানি ভবানী। আপশোসের কথা, যোগ্য রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই অমূল্য সম্পদের আজ বড় জীর্ণ দশা।

প্রকাশের উদ্যোগ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এমন বহুমুখী সারস্বত কর্মকাণ্ডের সংবাদ বা ফসল শুধু তার কেজো কার্যবিবরণীর মধ্যে মুখ লুকিয়ে না থেকে পৌঁছে যাক দূরবর্তী সচেতন মানুষের কাছে, এই আগ্রহ কর্মকর্তাদের মনে জাগাটা খুবই সংগত। সেই কারণেই পরিষৎ-পত্রিকার পরিকল্পনা। প্রথম থেকেই স্থির করে নেওয়া হয়, এই পত্রিকা হবে গম্ভীর গবেষণাধর্মী, বিদ্যোৎসাহী সচেতন মানুষরাই কেবলমাত্র হবেন এর উদ্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠী।

পরিষদের পঞ্চদশ বার্ষিক কার্যবিবরণীতে উল্লেখিত তদানীন্তন সম্পাদক আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের নির্দেশ পড়লে বোঝা যায় এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কতটা দৃঢ় এবং আপসহীন ছিলেন, '' 'সাহিত্য-পরিষৎ'-পত্রিকা অন্যান্য সাময়িক পত্র হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির পত্র হইবে... কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি তরল প্রকৃতির সাহিত্য কোনওকালে ইহাতে স্থান পাইবে না... যে সকল প্রবন্ধে কোনও নূতন আবিষ্কৃত তথ্যের অথবা নূতন তত্ত্বের স্থান নাই তাহা পরিষৎ-পত্রিকায় গৃহীত হয় না।... ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, গ্রাম্য সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, অথবা যে কোনও নূতন তত্ত্ব আলোচনাযোগ্য হইবে, তাহা... পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।... মুখ্যতঃ বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালি জাতি লইয়া সাহিত্য-পরিষদের তত্ত্বানুসন্ধান আবদ্ধ রহিয়াছে। এই সংকীর্ণ সীমামধ্যেও পরিষদের বিশাল কর্মক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে।... সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকার সাহায্যে সর্ববিধ জ্ঞানপ্রচার ও শিক্ষাচিন্তার চেষ্টা উপযুক্ত হইবে না, কারণ ইহা একটি তত্ত্বানুসন্ধানী সভার মুখপত্র। ইহা দ্বারা সেই সভার কার্যফল, গবেষণার ফল, অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করিতে হইবে।''

এত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মান অর্জন করা এবং তা ধরে রাখা সত্যিই বড় শক্ত। কিন্তু পরিষৎ-পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে সেই প্রায়-অসম্ভবকে সম্ভব করে গেছে। বরং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তার বহিরঙ্গ

নিয়ে—তার 'ঘুড়ির কাগজের মলাট', অপরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, পত্রিকা প্রচারের অব্যবস্থা। পুলিনবিহারী সেন সম্পাদনার দায়িত্ব নেওয়ার পর এইসব ত্রুটির সংশোধন হল খুব দ্রুত। পত্রিকার বিষয়গৌরব ও উচ্চমান তো সর্বাংশে বজায় রইলই, সেইসঙ্গে তিনি যোগ করলেন রুচিপূর্ণ অঙ্গসৌষ্ঠব। শোভন প্রচ্ছদ, পরিপাটি মুদ্রণ এবং সেইসঙ্গে প্রচারের সুব্যবস্থা সুনিশ্চিত করায় পুলিনবিহারী সেনের আমলে, প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের শেষের দিক থেকে স্বাধীনতা-উত্তর বেশ কিছু বছর পরিষৎ-পত্রিকা বাংলার সংস্কৃতি জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

ক্রমশ সারা বিশ্ব জুড়ে বিদ্যানুশীলন এবং গবেষণার জগতে এল বিশেষজ্ঞতার যুগ। বাংলার মননশীল শিক্ষিত সমাজও তার থেকে দূরে থাকল না। উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে একে একে জন্ম নিল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ, বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ, বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষদ ইত্যাদি বিশিষ্ট বিদ্যাশ্রয়ী সংস্থা। এরা নিজস্ব মুখপত্র প্রকাশ করতে শুরু করায় সর্বতোমুখী জ্ঞানচর্চার মঞ্চটি ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হতে থাকল। পরিষৎ-পত্রিকার ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ার সেই শুরু।

পরিষদের প্রকাশনার কথা বলতে গেলে অবশ্য শুধু পত্রিকাটির কথা বললে চলবে না। বলতে হবে তার গ্রন্থপ্রকাশের উদ্যোগের কথাও। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পাঁচ খণ্ডে 'ভারতকোষ' প্রকাশ। পরিষৎ পরিকল্পিত এবং প্রকাশিত, সুনির্বাচিত সম্পাদকমণ্ডলীর নেতৃত্বে অসংখ্য ভারতীয় জ্ঞানী-গুণীর সমবেত যোগদানে নিষ্পন্ন 'ভারতকোষ' সাহিত্য পরিষদের এক অতুল কীর্তি।

তাছাড়া এই মহাগ্রন্থ প্রস্তুতির কালে আর একটি লাভ হয়। এইসময় সম্পাদকমণ্ডলীর আহ্বানে কিছু উচ্চশিক্ষিত তরুণ সোৎসাহে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা অচিরেই সাহিত্য-পরিষদের অমোঘ আকর্ষণে বাঁধা পড়েন, হয়ে ওঠেন এখানকার পরবর্তী প্রজন্মের নির্ভরযোগ্য কর্মী ও কর্ণধার।

তবু কিছু আপশোস

প্রথম যুগে পরিষদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ তোষণের অভিযোগ আনা হত। সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ এবং সম্রাটের রাজ্যাভিষেকে আনন্দজ্ঞাপন তার কার্যবিধির অঙ্গ ছিল। রানি ভিক্টোরিয়ার গুণগান করতে গিয়ে এমনও বলা হয়েছে, ''তাঁহারই সিংহাসনছায়ায় বঙ্গভাষা অভূতপূর্ব লাবণ্যশ্রী পাইয়াছে।'' অবশ্য ক্ষমতাকেন্দ্রের প্রতি এমন নির্ভরতা ও তোষণ যেকোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষেরই স্বাভাবিক, বিশেষত পরাধীন দেশের সদ্য-প্রতিষ্ঠিত এক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে।

কিন্তু বাংলার তদানীন্তন কিছু সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমী উচ্চবিত্ত ভূস্বামীর অকুণ্ঠ বদান্যতা পরিষদকে আর্থিকভাবে অনেকটা স্বাবলম্বী করেছে। উল্লেখযোগ্য দাতাদের মধ্যে রয়েছেন শোভাবাজার রাজপরিবারের বিনয়কৃষ্ণ দেব, কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, লালগোলার যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, নাড়াজোলের নরেন্দ্রনাথ খাঁ, ময়মনসিংহের সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, বর্ধমানের মহারাজ বিজয়চন্দ্র মহতাব প্রমুখ।

বিভিন্ন সময়ে বহু বিশিষ্ট মানুষ অথবা তাঁদের উত্তরসূরী ব্যক্তিগত বইয়ের সংগ্রহ দান করে পরিষৎ গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রথম যুগে উল্লেখযোগ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সংগ্রহ। স্বাধীনতার পর ভারত সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করায় সাহিত্য পরিষদের আর্থিক অনিশ্চয়তা দূর হয়।

কিন্তু প্রথম থেকেই সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃপক্ষের অতৃপ্তি, সামান্য কিছু পণ্ডিত-গবেষকের বৃত্তের বাইরে শিক্ষিত বাঙালিকে তাঁরা আকর্ষণ করতে পারছেন না। এই সীমাবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসার

জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে লোকরঞ্জক বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বক্তাদের তালিকায় রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যদুনাথ সরকার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, অন্নদাশংকর রায় প্রমুখ বহু বাঙালি চিন্তক। এইসঙ্গে নানা উপলক্ষ্যে পরিষৎ প্রাঙ্গণে উৎসব, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করা হয় যার টানে ''শিক্ষিত সাধারণ মানুষের মন্দির হয়ে উঠতে পারে সাহিত্য পরিষৎ''। পরিষৎ-পত্রিকাটিকেও সাধারণ পাঠকের মনোজ্ঞ করে তোলার চেষ্টা হয় বিভিন্ন সময়ে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একসময় মন্তব্য করেছিলেন, ''পত্রিকার প্রবন্ধগুলি প্রায়ই সব পণ্ডিতদের জন্য লেখা, পাদটীকা ও উদ্ধৃত অংশের টীকায় পরিপূর্ণ। সাধারণ পাঠক পড়িতে পারে না—তাহাদের জন্য গল্পের মতো করিয়া লেখা উচিত...। পত্রিকা যদি মুখরোচক হয়, তাহা হইলে অনেকে সদস্য হতে চাহিবেন, নাহলে চাহিবেন না।"

এই নানামুখী উদ্যোগের কোনওটিই কিন্তু ফলপ্রসূ হয়নি—পরিষদের সৃজন-ভূমিতে শিক্ষিত সচেতন বাঙালিকে আকৃষ্ট করা যায়নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পরিষদের সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ, নিবিড় যোগাযোগ প্রসঙ্গে শেষ জীবনে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে এক আবেগঘন বিবৃতি দিয়েছিলেন, ''[সাহিত্য পরিষদের] উদ্দেশ্য, বাংলার সীমার মধ্যে মানুষ যাহা কিছু করিয়াছে, সেইগুলি বাহির করা এবং তাহার একটা উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেওয়া,—ইহাতে মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে না,—এরূপ খাঁটি মঙ্গলময় ব্যাপারে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিলেও সেটা আমি ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি।

''আপনারা যদি ধর্ম্ম অধর্ম্ম না মানেন, আমি সেটা পুণ্য বলিয়া মনে করি, আপনারা যদি পাপপুণ্য না মানেন, আমি সেটা ভাগ্য বলিয়া মনে করি—আপনারা মানুন আর নাই মানুন, আমি ইহাকে ধর্ম্ম, পুণ্য ও ভাগ্য এই তিন বলিয়াই মানি এবং আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি এরূপ পুণ্যময়, অনুষ্ঠানের সহিত এত দীর্ঘকাল জড়িত ছিলাম।"

কিন্তু আপশোসের কথা, এই আবেগ স্পর্শ করতে পারেনি শিক্ষিত বাঙালির সিংহভাগকে। স্বাধীনতা-পূর্ব অবিভক্ত বঙ্গে পরিষদের প্রভাব ছিল সীমিত, স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে তার প্রভাব সীমিততর। তার জন্য কোনও পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করতে গেলে মনে পড়বে কালদর্শী কবির আগাম ভর্ৎসনা : পরিষদের প্রথম বাৎসরিক সম্মিলনীতেই রবীন্দ্রনাথ বলে রেখেছিলেন, ''যদি বলেন, সাহিত্য পরিষৎ এতদিনে কী এমন কাজ করিয়াছে, তবে সে কথাটা ধীরে বলিবেন, এবং সংকোচের সহিত বলিবেন। আমাদের দেশের কাজের বাধা যে কোথায় তাহা আমরা তখনই বুঝিতে পারি যখনই আমরা নিজেরা কাজ হাতে লই—সে বাধা আমরা নিজেরা, আমরা প্রত্যেকে।"

বাস্তবিক, বাঙালির ঐতিহ্যকে খুঁজে আনার এবং রক্ষা করার ব্রত নিয়েছে যে-পরিষৎ তাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আমরাই দায়ী, আমরা প্রত্যেকে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১২৫ বর্ষপূর্তিতে শিক্ষিত বাঙালি সেই পাপস্খালনে উদ্যোগী হোক, পরিষদে নবজীবন আসুক, বাঙালির মননচর্চা দীর্ঘজীবন লাভ করুক। ✠

ঋণস্বীকার

১। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, পরিষৎ-এর শতবর্ষপূর্তি স্মারক সংখ্যা, ১৯৯৭
২। অধ্যাপক বারিদবরণ ঘোষ